সংগঠনের পরিবেশের কৌশলগত বিশ্লেষণ

Strategic Analysis of Organisational Environment

৩

পরিবেশ বলতে আমাদের চারিদিকে বিরাজমান ঐ সব উপাদান ও শক্তিগুলোকে বোঝায়, যা আমাদের জীবন, সমাজ ও সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ পরিবেশ আবার পরিবর্তনশীল। ফলে, পরিবেশের প্রভাবেও পরিবর্তন হয়। আমাদের জীবন, সমাজ ও সংগঠনের টিকে থাকার জন্য পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো দরকার হয়। তা না পারলে প্রত্যেকই ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা বিলোপ হয়ে যেতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ইউনিটে বহিস্থপরিবেশ ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-৩.১ :সংগঠনের বহিস্থ পরিবেশের কৌশলগত বিশ্লেষণ পাঠ-৩.২ :সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের কৌশলগত বিশ্লেষণ ও পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনা	

পাঠ-৩.১ সংগঠনের বহিস্থ পরিবেশের কৌশলগত বিশ্লেষণ

Strategic Analysis of Organisational External Environment

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- সাংগঠনিক পরিবেশ কাকে বলে তা বলতে পারবেন
- বহিস্থপরিবেশ কী তা বলতে পারবেন
- বহিস্থপরিবেশ বিশ্লেষণ কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন
- বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বহিস্থপরিবেশের উপাদানগুলো কী কীতা বলতে পারবেন
- সাধারণ/মেগা পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদানের বর্ণনা করতে পারবেন
- কার্যপরিবেশ কী তা বলতে পারবেন
- কার্যপরিবেশের উপাদানগুলো কী কীতা বলতে পারবেন
- কার্য পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদানের বর্ণনা করতে পারবেন

সাংগঠনিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়

What is meant by the organizational environment

সাংগঠনিক পরিবেশ হলো পরিবেশের ঐ সকল উপাদান ও শক্তি যা সংগঠনের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে। সকল সংগঠনই কোনো না কোনো দেশে, সমাজে, অর্থনীতিতে ও সর্বোপরি বৈশ্বিক পরিবেশে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। সে জন্য সে সকল দেশের আইনকানুন, সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক পলিসি ও অবস্থা, রাজনৈতিক দর্শন, প্রযুক্তিগত অবস্থা ইত্যাদির আলোকে তাদের ব্যবসায় বা কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হয়। এটি না করলে তারা যেমন ব্যবসায় করার অনুমতি পায় না, তেমনই অনুমতি পেলেও ব্যবসায় টিকিয়ে রাখতেও পারে না। এ উপাদান ও শক্তিগুলো নিয়েই সাংগঠনিক পরিবেশ।

সাংগঠনিক পরিবেশ দুরকম- অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও বহিস্থ পরিবেশ। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ হলো পরিবেশের ঐ সকল উপাদান ও শক্তি, যার ওপর সংগঠনিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব আছে। বহিস্থ পরিবেশ হলো পরিবেশের ঐ সকল উপাদান ও শক্তি, যার ওপর সংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কোনো প্রভাব নেই। এ পাঠে বহিস্থ পরিবেশ নিয়েই আলোচনা করা হবে।

বহিস্থ পরিবেশ কাকে বলে

What is external environment

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, বহিস্থ পরিবেশ হলো পরিবেশের ঐ সকল উপাদান ও শক্তি, যার ওপর সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কোনো প্রভাব নেই। একটি দেশে বা অর্থনীতিতে কর্মরত সকল প্রতিষ্ঠানই এ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ জন্য বহিস্থ পরিবেশকে সাধারণ পরিবেশ, সামষ্টিক পরিবেশ. অ-নিয়োন্ত্রণযোগ্য পরিবেশ ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। বাইয়ার, রু ও জাহরা (১৯৯৬) বলেন, "একটি সংগঠনের বহিস্থ পরিবেশ প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রতিযোগী ও অন্যান্য শক্তিসমূহ নিয়ে গঠিত যারা সংগঠনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নেই।" বার্টল ও মার্টিন (১৯৯৪) বলেন যে, "বহিস্থ পরিবেশ হলো সংগঠনের বাইরের মূখ্য শক্তিসমূহ যাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও সাফল্যের ওপর প্রবল প্রভাব আছে এবং যাদের ওপর ব্যবস্থাপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই"। এ কারণে প্রতিষ্ঠানকেই তাদের মত হয়ে যেতে হয়, তা না হলে বাজারে টিকে থাকতে পারে না। এমন অবস্থায় কৌশলবিদগণকে বহিস্থ পরিবেশের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখতে হয়। এবার চলুন জানা যাক বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়।

বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়

What is meant by the external environmental analysis

বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ কৌশলগত ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি প্রতিষ্ঠান তার চারপাশের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ব্যবসায় করতে পারে না। এগুলো প্রতিষ্ঠানের বাইরের শক্তি ও পক্ষ, যাদের ওপর প্রতিষ্ঠানের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই, কৌশলবিদগণের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে এ পরিবেশকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করা ও পর্যালোচনা করা। ফলে, কোথাও কোনো বিপদের আশংকা থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া যায় বা ঝুঁকি হ্রাস করা চেষ্টা করা যায় এবং কোথাও কোনো সুযোগ থাকলে সময় মতো তা কাজে লাগানো যায়। এ কাজগুলো করার নামই বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ। বাইয়ার, রু ও জাহরার (১৯৯৬) মতে বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ হলো ঐ সকল শক্তিগুলো পরীক্ষা করা যাদের ওপর সংগঠনের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই কিন্তু যারা সংগঠনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। মিলার ও ডেস (১৯৯৬)এর মতে বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা কৌশলবিদগণ পরিবেশকে মনিটরিং করে সংগঠনের জন্য সুযোগগুলো ও এর উপর হুমকিগুলো চিহ্নিত করে। বহিস্থ পরিবেশেই সুযোগগুলো থাকে, আবার হুমকিগুলোও থাকে। এ পরিবেশের উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে কৌশলবিদগণ সুযোগগুলো চিহ্নিত করে ও তা সংগঠনের স্বার্থে ব্যবহার করার মাধ্যমে সাংগঠনিক সাফল্য নিশ্চিত করে। আবার এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৌশলবিদগণ সংগঠনের প্রতি বহিস্থ পরিবেশ থেকে আগত সম্ভাব্য হুমকিগুলো চিহ্নিত করে এবং সেগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা যায় তার কলাকৌশল বের করে সংগঠনকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। এ কারণে বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ কৌশলগত ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই জরুরি একটি কাজ। যা হোক, এবার আমরা বহিস্থ পরিবেশের ধরন ও উপাদানগুলো সম্পর্কে জানব।

বহিস্থ পরিবেশের ধরন ও উপাদান

Types and elements of external environment

বহিস্থ পরিবেশদুই ধরনের হয়। একটি হলো সাধারণ পরিবেশ বা মেগা পরিবেশ আর অন্যটি হলো শিল্প বা কার্য পরিবেশ। আমরা প্রথমে সাধারণ বা মেগা বহিস্থ পরিবেশ ও পরে শিল্প বা কার্য বহিস্থ পরিবেশ সম্পর্কে জানব।

সাধারণবা মেগা পরিবেশ

General or mega environment

সাধারণ বা মেগা পরিবেশ হলো বহিস্থ পরিবেশের ঐ সকল উপাদান যা সমাজের বৃহত্তর অবস্থা ও ধারা প্রকাশ করে এবং যার মধ্যে একটি সংগঠন কাজ করে। মেগা পরিবেশ সংগঠনের বাইরের একটি অবস্থা যা সমাজে বা অর্থনীতিতে কর্মরত সকল সংগঠনের জন্য একটা সাধারণ পরিবেশ। মেগা পরিবেশের প্রভাব সমাজের সকল ধরনের সংগঠনের জন্যই সমান। এ কারণে এটি সাধারণ পরিবেশ। প্রতিষ্ঠানের কৌশলের ওপরও এ পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং মেগা পরিবেশের প্রকৃতির বিবেচনায় কৌশল নির্বাচন করতে হয়। সাধারণ পরিবেশের উপাদান ছয়টি: জনমিতিগত, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, আইনগত-রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ। এ পরিবেশকে কোনো একক সংগঠন তেমন প্রভাবিত করতে না পারলেও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংগঠনগুলো প্রভাবিত করতে পারে।

শিল্প বা কার্য পরিবেশ

Industry or task environment

শিল্প বা কার্য পরিবেশ বলতে বহিস্থ পরিবেশের ঐ সব উপাদানগুলোকে বোঝায়, যাদের সঙ্গে সংগঠন এর ব্যবসায় সম্পাদন কালে মুখোমুখী হয় ও যারা সংগঠনের ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো সংগঠনের খুবই সন্নিহিত উপাদান। শিল্প পরিবেশের উপাদান ও প্রভাব সংগঠনের পণ্য ও সেবার প্রকৃতি ও যে বাজারে ব্যবসায় করতে চায় তার ভৌগলিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।শিল্প বা কার্য পরিবেশ হলো বহিস্থ পরিবেশ। তাই এর ওপর সংগঠনের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে

না। তবে, সাধারণ বহিস্থ পরিবেশের চেয়ে শিল্প পরিবেশকে একক সংগঠন প্রভাবিত করে নিজের পক্ষে আনার ক্ষেত্রে বেশী সফল হয়। কৌশলবিদগণ সংগঠনের পণ্য ও অবস্থানের আলোকে এ শিল্প পরিবেশের উপাদানগুলো চিহ্নিত করেন ও তা বিশ্লেষণ করে সুযোগ গ্রহণ ও হুমকি মোকাবেলার কৌশল বের করেন।

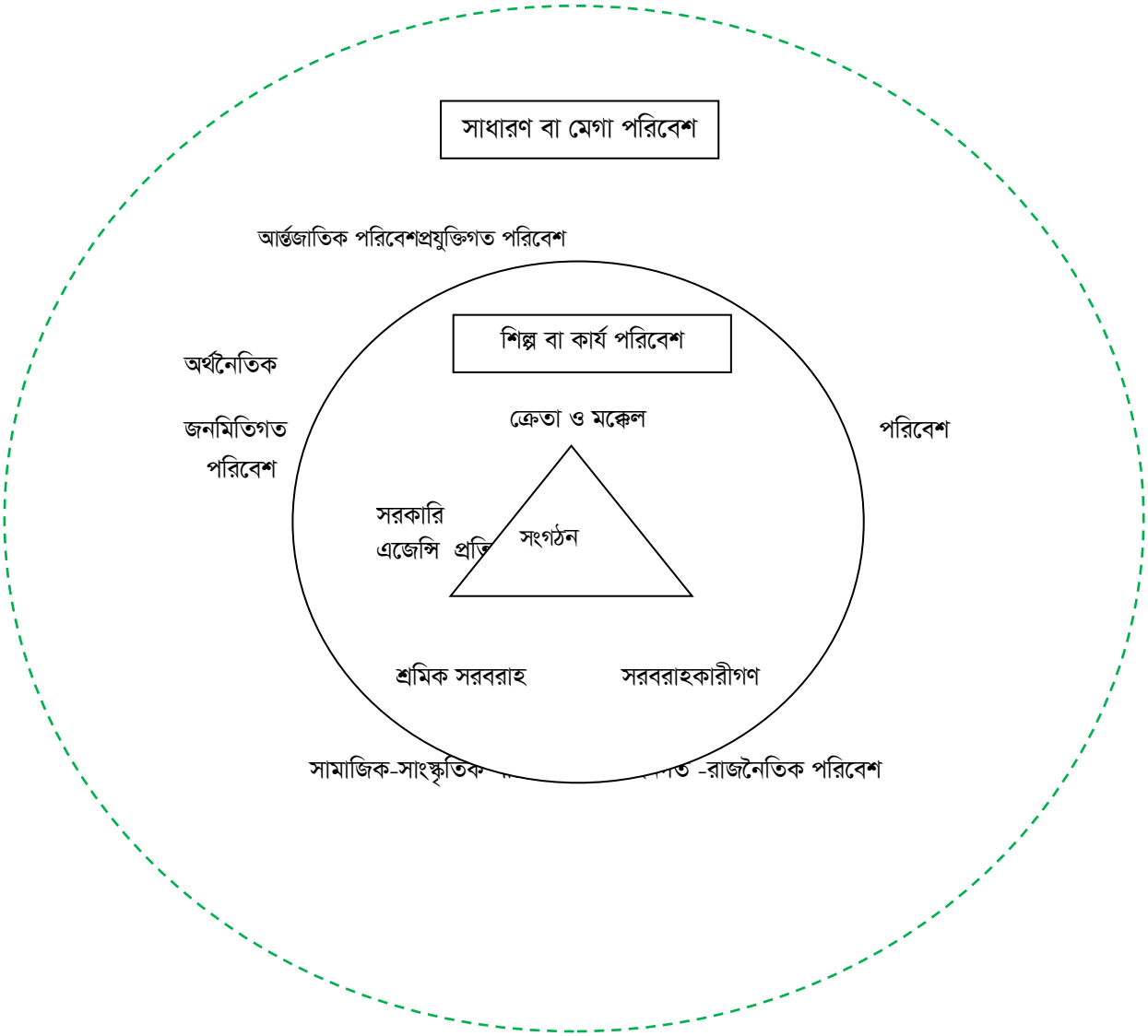

এবার আমরা বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলাপ করব। তারপর আমরা প্রথমেসাধারণ বহিস্থ পরিবেশের উপাদানগুলো আলোচনা করব এবং এর পর বহিস্থ শিল্প পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করব।

বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা

Need for analysing external environment

১। বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ করা জরুরি এ জন্য যে, এ পরিবেশ সংগঠনের কৌশল পরিবর্তনে মূখ্য প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। কৌশল নির্ধারণের সময় কৌশলবিদগণ বিদ্যমান বহিস্থ পরিবেশের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য নেন ও সম্ভাব্য বহিস্থ পরিবেশের অবস্থা সম্পর্কে পূর্বানুমান করেন এবং তার ওপর ভিত্তি করেই কৌশল নির্ধারণ করেন। কোনো কৌশলই কাজ

করবে না, যদি বহিস্থ পরিবেশের কোনো উপাদান সম্পর্কে গৃহীত অবস্থা ঠিক না থাকে। বহিস্থ পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথেই কৌশলের পরিবর্তন করতে হবে। তা না করলে বাজারে টিকে থাকা যাবে না।

২। বহিস্থ পরিবেশের মধ্যেই ব্যবসায়ের জন্য সুযোগ ও এর উপর হুমকিগুলো বিরাজ করে। বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এর মধ্যে সংগঠনের জন্য যে যে সুযোগগুলো রয়েছে তা চিহ্নিত করা হয় এবং সেগুলো গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে, পরিবেশ বিশ্লেষণ করে সংগঠনের ব্যবসায়ের ওপর যে হুমকিগুলো আছে তা চিহ্নিত করা হয় ও সেগুলো মোকাবেলা করার কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

৩। বহিস্থ পরিবেশের পরিবর্তনে শিল্পের আওতা ও প্রতিযোগিতার যুদ্ধ লাইনে পরিবর্তন হয়। সরকার যদি অর্থনৈতিক নীতিমালা শিথিল করে বিভিন্ন শিল্প বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, তা হলে যেমন শিল্পের আওতা বাড়বে তেমনই প্রতিযোগিতার যুদ্ধক্ষেত্রেও পরিবর্তন হবে। বহিস্থ পরিবেশ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এগুলো পূর্বাহ্নে অথবা দ্রুত চিহ্নিত করে সাংগঠনিক কৌশলে পরিবর্তন করতে পারলে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ধরে রাখা যায়।

৪। বহিস্থ পরিবেশেরএকই রকম ধারা বিভিন্ন শিল্পের জন্য বিভিন্ন রকম প্রভাব ফেলতে পারে। পরিবেশগত উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এ নানামুখী প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। ফলে নিজ নিজ শিল্পে কৌশলবিদগণ সঠিক কৌশল গ্রহণ করতে পারে। যেমন স্বাস্থ্য ও ফিটনেস সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার কারণে ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি ও খেলাধুলার জুতার চাহিদা বাড়লেও মাংস ও খামার পণ্যের চাহিদা কমে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বহিস্থ পরিবেশের বিশ্লেষণই পারে উপযুক্ত কৌশল বা পাল্টা কৌশল নির্বাচনে সাহায্য করে সংগঠনকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলতে।

৫। বহিস্থ পরিবেশের অনেক উন্নয়ন ও পরিবর্তন যে কোন মাত্রার সঠিকতায় পরিমাপ করা বেশ কঠিন। তাই, বহিস্থ পরিবেশের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছাড়া এ সব উপাদান যেমন সুদের হারের উত্থান-পতন, মূল্যস্ফীতির হার, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্য ইত্যাদি উপাদানের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাষ দেওয়া কঠিন। এ জন্য পরিবেশগত উপাদানগুলোর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমেই কেবল তথ্য জানা যায় ও সঠিক কৌশল অবলম্বন করা যায়।

৬। দেশে দেশে ব্যবসায়ের ওপর বহিস্থ পরিবেশের উপাদান ও তাদের প্রভাব নানা রকম হয়ে থাকে। এ কারণে পরিবেশগত উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা ছাড়া এ প্রভাব সম্পর্কে জানা যায় না ও উপযুক্ত কৌশলও গ্রহণ করা যায় না।

৭। গবেষণায় প্রমাণিত যে, বহিস্থ পরিবেশ ও কৌশল এক লাইনবন্দি করা ও ব্যবসায়িক সাফল্যের মধ্যে শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে। এ লাইনবন্দি করার জন্য পরিবেশগত উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৮। কৌশলবিদগণ বহিস্থ পরিবেশের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার কারণে ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত সুযোগ চিহ্নিতকরণ ও তা গ্রহণের জন্য যথোপযুক্ত কৌশল নির্বাচন করার জন্য সময় পায়।

সাধারণ বা মেগা পরিবেশের আলোচনা

Discussion of general or mega environment

১. প্রযুক্তিগত পরিবেশ (Technological environment)

প্রযুক্তিগত পরিবেশ বলতে পণ্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত বিদ্যমান জ্ঞানকে বোঝায়। এ পরিবেশের মধ্যে শুধু বিস্ময়কর উদ্ভাবনই পড়ে না, পদ্ধতি, মালামাল, নকশা, প্রয়োগ, দক্ষতা, নতুন শিল্পের বিস্তার ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন হয় তাও পড়ে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও পরিবর্তনে অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবে প্রভাবিত হয়। তবে, অনেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কারিগরি জ্ঞান ও পেটেন্ট রাইট থাকে যা তাদেরকে কিছু দিনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দেয়। তবে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরিবর্তনের মুখে তারাও বিপদে পড়তে পারে। সকল সংগঠনই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও পরিবর্তনের প্রভাব অনুভব করে। এ জন্য বাজারে টিকে থাকার স্বার্থে প্রযুক্তির পরিবর্তন পূর্বানুমান করা, পরিবর্তনের প্রভাব নির্ধারণ করা ও যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য যথাযথ সময় নির্বাচন করা কৌশলবিদগণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত। ছোটো ও বড়ো সকল পরিবর্তন ও উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ জরুরি নয়, প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো নজরে রাখা ও কৌশল প্রণয়নে বিবেচনা করা জরুরী।

২. জনমিতিগত পরিবেশ (Demographic environment)

জনমিতিগত পরিবেশ হলো কোন একটি ভূখণ্ডের জনসংখ্যার সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান। যেমন জনসংখ্যার পরিমাণ, ঘনত্ব, শিক্ষা, বয়স, জেন্ডার,বর্ণ, পেশা, আয়, ধর্ম, আঞ্চলিক বসবাস, ভোগের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য, ক্রয় অভ্যাস, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি তথ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান নিয়ে জনমিতিগত পরিবেশ গঠিত। ব্যবসায় কৌশল গ্রহণের জন্য জনমিতিগত পরিসংখ্যান মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বাজার চাহিদা, মানুষের ভোগের প্রকৃতি, জীবনযাত্রার মান ও ব্যয়, সঞ্চয়ের পরিমাণ, বিনিয়োগের ধরন ইত্যাদি তথ্য ব্যবহার করে কৌশলবিদগণ বিনিয়োগ, পণ্য উৎপাদন ও উদ্ভাবন, মূল্য, বাজার, বিনিয়োগ প্রত্যাহার, বাজার বিভক্তিকরণ ইত্যাদিসহ আরও অনেক বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করে থাকে। জনমিতিগত তথ্য না থাকলে এসব বিষয়ে কোন কৌশলই গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। দেশ ও বিদেশের তথা সারা বিশ্বের জনমিতিগত পরিসংখ্যান ব্যবহার করে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য পণ্যের চাহিদা ও প্রকার, মূল্য, প্রচার, ডেলিভারি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসায়িক কৌশল গ্রহণ করা হয়।

৩. আইনগত - রাজনৈতিক পরিবেশ (Legal -political environment)

আইনগত ও রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে একটি দেশের আইন, শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামো ও বিধিবিধানকে বোঝায়, যার অধীনে ব্যবসায় পরিচালিত হয়। সাংগঠনিক পণ্য ও সেবা বাজারজাতকরণে, সংগঠন পরিচালনায়, কার্য ঘণ্টা ও কার্য অবস্থা নির্ধারণে, কর্মী নিয়োগে, শাস্তিদানে, বেতন প্রদানে, কারখানা নির্মাণে ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ও অন্যান্য বিষয়ে আইন আছে ও নতুন আইন হচ্ছে। এছাড়া, বিজ্ঞাপন, পণ্য মূল্য, প্রতিষ্ঠানের একত্রিকরণ ও অধিগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়েও আইন রয়েছে। মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, কারখানা পরিদর্শন সংস্থা, বাজার পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, দূর্নীতি দমন সংস্থা, রাজস্ব আদায় সংস্থা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, মানবধিকার কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, আয়কর ও ভ্যাট সংস্থাসহ অন্যান্য আরও অনেক সংস্থা ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করে। এ সকল আইন ও সংস্থার আওতায় থেকে ব্যবসায় কৌশল প্রণয়ন করতে হয়।

রাজনৈতিক দর্শনের কারণে সরকারি দল ব্যবসায় ক্ষেত্রের আওতা ও বিনিয়োগ সংকোচন বা প্রসারণ পলিসি নিতে পারে। ফলে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভুর্তুকি প্রদান বা প্রত্যাহার, কর অব্যাহতি, কর রেয়াত, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক হ্রাস বা বৃদ্ধি হতে পারে। এ সকল অবস্থার প্রভাব ব্যবসায়ের কৌশল নির্ধারণের ওপর পড়ে। শুধু তাই নয়, নানা চাপ প্রয়োগকারী দলও ব্যবসায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন পরিবেশ রক্ষা পরিষদ, জনস্বার্থ রক্ষা আন্দোলন, ভোক্তা অধিকার আন্দোলন ইত্যাদি সংস্থার দাবিগুলোকেও ব্যবসায় কৌশল নির্ধারণে বিবেচনা করতে হয়। সার্বিক বিচারে বলা যায়, আইনগত ও রাজনৈতিক পরিবেশ কৌশলগত ব্যবস্থাপনার মূখ্য বিচার্য বিষয়, যার নিয়ন্ত্রণ রেখার মধ্যে ব্যবসায় কৌশল নির্ধারণ করতে হয়।

৪. সামাজিক-সাঙ্কৃতিক পরিবেশ (Socio-culturalenvironment)

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলতে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠির মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আচার, রীতিনীতি, আচরণ, সমাজ কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস, ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামাজিক -সাঙ্কৃতিক ধারাগুলোকে বোঝায়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশই মানুষের পণ্য ও সেবার চাহিদার মূল নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। এ জন্য কৌশলবিদগণকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্য নির্বাচন ও নকশাকরণ, মূল্য নির্ধারণ, বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করতে হয়। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায় সংগঠনের জন্য আবার অন্য দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে হয়। দুই দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে ম্যাকডোনালসকে 'সব দেশে একই কর্মপদ্ধতি' নীতি শিথিল করতে হয়েছে, এমন কী মেনুতেও পরিবর্তন করতে হয়েছে। ব্রাজিলে ম্যাকডোনালস আমাজান বেরির কোমল পানীয় বিক্রি করছে। এ সবই করা হয়েছে একটি দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পণ্য বা সেবাকে খাপ খাওয়ানোর জন্য এবং এ ভাবেই বাজারে টিকে থাকা যায়।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে বা নতুন হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারায় পরিবর্তনের ফলে কোনো কোনো পণ্যের চাহিদায় আবার বদল হতে পারে। যেমন, বয়স্ক নাগরিকের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ঔষধের চাহিদা বদলে গেছে। শিশু জন্মের হার কমে যাওয়ায় শিশু পোশাকের

চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। এ সব কারণে কৌশলবিদগণ এ পরিবর্তনের ওপর নজর রাখে, পরিবর্তনের ধরন বিশ্লেষণ করে এবং নতুন পণ্য বা সেবা উদ্ভাবন, পণ্য বা সেবার নকশা পরিবর্তন, বাজারজাতকরণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন, ও হুমকি মোকাবেলায় যথোপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবন করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।

৫. অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic environment)

অর্থনৈতিক পরিবেশ বলতে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ ব্যবস্থাকে বোঝায়। পৃথিবীতে তিন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে। সেগুলো হলো ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুক্ত বাজার বিরাজ করে এবং চাহিদা ও সরবরাহের পক্ষপাতহীন আচরণের মাধ্যমে পণ্য মূল্য নির্ধারিত হয়। এখানে উৎপাদনের উপকরণ ব্যক্তি মালিকানায় থাকে ও বাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে এবং রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমন্বিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কিছু কিছু খাত ব্যক্তি মালিকানায় চলে, কিছু কিছু খাত রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে, আবার কিছু কিছু খাত উভয় মালিকানায় চলে। যেমন বাংলাদেশে আর্থিক খাত তথা ব্যাংক, বিমা, মূলধনী বাজার ইত্যাদি খাত উভয় মালিকানায় চলছে।

অর্থনৈতিক পরিবেশ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবর্তনশীল এবং নানা ভাবে সম্পর্কিত। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য কৌশলবিদগণকে সকল পর্যায়ের অর্থনেতিক অবস্থাকে আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। স্থানীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর অর্থনৈতিক ভিত্তি, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, মজুরি হার, ব্যয়যোগ্য আয়, বেকারত্ব, পরিবহন ও বাণিজ্যিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য জানা দরকার। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা, জাতীয় আয়, মূল্যোস্ফীতি, পরিশোধ স্থিতি, বাণিজ্য স্থিতি, আয়কর, রাজস্ব আয়ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য, যা থেকে একটি অর্থনীতির পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও ভোগের সক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায়। কৌশলবিদগণ এ সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ, পণ্য ও সেবা সৃষ্টি ও উদ্ভাবন, নতুন বাজার সম্ভাবনা, নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্র, প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা, বাজার দখল ইত্যাদি সম্পর্কে কৌশল নির্ধারণ করে। সর্বশেষে বলা যায়, ব্যবসায় শুরু করা, টিকে থাকা ও অগ্রগতি লাভ করার জন্য অর্থনৈতিক পরিবেশের নজরদারি ও বিশ্লেষণ করা কৌশলগত ব্যবস্থাপনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ

International environment

আন্তর্জাতিক পরিবেশ বলতে যে দেশে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় কার্যক্রম সম্পাদন করছে তার বাইরে অন্যান্য দেশে বা সংস্থায় সংঘটিত ঐ সব ঘটনা ও পরিবর্তনকে বোঝায় যেগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে পারে। এ জন্য কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ ও তার ভিত্তিতে কৌশল নির্ধারণ ব্যবসায়ে সাফল্য এনে দিতে পারে। বিভিন্ন দেশের মুক্ত বাণিজ্য এলাকা, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি থেকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তর, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইন্টারন্যাশন্যাল অর্গানাইজেসন ফর স্টান্ডার্ডাইজেসন (আই.এস.ও.), কোনো দেশের মুদ্রা মান ও বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন ইত্যাদি অবস্থা দেশীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন সুযোগ অথবা হুমকি তৈরি করতে পারে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য এ পরিবেশ বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দেশে দেশে এ সব পরিবর্তনের দিকে নজরদারি করতে পারলে এবং সময় বুঝে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে পারলে ব্যবসায়ে সফলতা যেমন ধরে রাখা যায়, তেমনই এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা যায়।

এবার আমরা কৌশলগত ব্যবস্থাপনার বহিস্থ পরিবেশের আর একটি অংশ শিল্প বা কার্য পরিবেশের উপাদানগুলো ও কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প বা কার্য পরিবেশের আলোচনা

Discussion of industry or task environment

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, শিল্প বা কার্য পরিবেশ বলতে বহিস্থ পরিবেশের ঐ সব উপাদানগুলোকে বোঝায় যাদের সঙ্গে সংগঠন এর ব্যবসায় সম্পাদনকালে মুখোমুখী হয় ও যারা সংগঠনের ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো সংগঠনের

খুবই নিকটতম উপাদান। শিল্প বা কার্য পরিবেশ হলো বহিস্থ পরিবেশ। তাই এর ওপর সংগঠনের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।তবে, সাধারণ বহিস্থ পরিবেশের চেয়ে শিল্প পরিবেশকে একক সংগঠন প্রভাবিত করে নিজের পক্ষে আনার ক্ষেত্রে বেশী সফল হয়। কৌশলবিদগণ সংগঠনের পণ্য ও অবস্থানের আলোকে এ শিল্প পরিবেশের উপাদানগুলো চিহ্নিত করেন ও তা বিশ্লেষণ করে সুযোগ গ্রহণ ও হুমকি মোকাবেলার কৌশল বের করেন।

এই শিল্প বা কার্য পরিবেশের উপাদানগুলো হলো ক্রেতা ও মক্কেল, প্রতিযোগীরা, সরবরাহকারীগণ, শ্রমিক সরবরাহ এবং সরকারি এজেন্সিসমূহ। এবার প্রত্যেকটি উপাদানের আলোচনা।

ক্রেতা ও মক্কেল (Customer and clients)

একটি প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য বা সেবা বর্তমানে যে সব ক্রেতা ও প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে থাকে এবং ভবিষ্যতে ক্রয় করতে পারে তারা মিলে হয় ক্রেতা ও মক্কেল। যারা দ্রব্য কেনে তারা হলো ক্রেতা এবং যারা সেবা গ্রহণ করে তারা হলো মক্কেল। তবে আজকাল উভয় শ্রেণিকেই ক্রেতা বা কাস্টমার নামে ডাকা হচ্ছে। ক্রেতা ও মক্কেলরা সরাসরি ভাবে প্রতিষ্ঠানের বাজার, স্থায়িত্ব ও সাফল্য নির্ধারণ করে। সে কারণে ক্রেতা ও মক্কেলদেরপছন্দ-অপছন্দ ও অগ্রাধিকার বিবেচনা করে দ্রব্য ও সেবার নকশা, আকার, দাম, প্রাপ্তি, প্রকার ও পরিবেশ নির্ধারণ করা দরকার। ক্রেতা সন্তুষ্টি যে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার ও সাফল্যের চাবিকাঠি। এ জন্য কৌশলবিদগণ ক্রেতা ও মক্কেলদের মনোভাব ও পছন্দ জরিপ করার মাধ্যমে কী ধরনের দ্রব্য ও সেবা ক্রেতারা চাচ্ছে তা জানার চেষ্টা করেন ও সে অনুযায়ী পণ্য ও বাজারজাতকরণ কৌশলসহ অন্যান্য সহযোগী কৌশল নির্ধারণ করেন।

প্রতিযোগীরা (Competitors)

একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবার অনুরূপ পণ্য বা সেবা যে সব প্রতিষ্ঠান বাজারজাতকরণ করে বা যে সব প্রতিষ্ঠানের বাজারজাত করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তারা হলো প্রতিযোগী। এ সকল প্রতিযোগী সরাসরি প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন তারা উদ্ভাবনী ও সৃষ্টিশীল কলাকৌশলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বাজার দখল করে নিতে পারে, প্রতিষ্ঠানের পণ্য, মূল্য, বণ্টন প্রণালি ও প্রসার কার্যক্রমকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে, এমনকি বাজার থেকে বের হতে বাধ্য করতে পারে। এ কারণে বাজারে টিকে থাকতে হলে কৌশলবিদগণকে প্রতিযোগীদের শুধু চিনলে হবে না, যে সব নতুন প্রতিযোগী বাজারে আসার অবস্থায় আছে তাদেরকেও চিনতে হবে, সকল প্রতিযোগীদের কর্মকাণ্ড ও তাদের কলাকৌশলের দিকে নজর রাখতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

সরবরাহকারীগণ (Suppliers)

যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ তথা কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ, অর্ধসমাপ্ত পণ্য,সেবা ইত্যাদি সরবরাহ করে, সে সকল সরবরাহকারীগণ বহিস্থ হলেও ব্যবসায়কে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করে। সরবরাহকারীগণ যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিতে পারে। তারা যদি কোনো কারণে সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তা হলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, প্রতিষ্ঠান বাজার হারাবে ও প্রতিষ্ঠানটি বিলোপ হয়ে যেতে পারে। এ কারণে কৌশলবিগণকে সরবরাহকারীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে মানসম্পন্ন সম্পদের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। এ জন্য উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে এবং তার যথাযথ প্রয়োগ করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে।

শ্রমিক সরবরাহ (Labour supply)

একটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সরবরাহ বলতে এ প্রতিষ্ঠানের নানা কাজের জন্য নিয়োগযোগ্য উপযুক্ত গুণ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বোঝায়। এটি প্রমাণিত যে, প্রতিযোগিতামূলক পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করে শিল্পে টিকে থাকার জন্য সর্বপেক্ষা অপরিহার্য উপাদান হলো যোগ্য ও দক্ষ মানব সম্পদ। এ ধরনের শ্রমিকদের সংগঠনের প্রতি আকর্ষণ করা, তাদেরকে প্রণোদিত করা ও সংগঠনে তাদেরকে ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য কৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন করা কৌশলগত ব্যবস্থাপনার জন্য অতীব জরুরি কাজ। কৌশলবিদগণ শ্রমিক সরবরাহের উৎস ও ধারা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণ করে শীর্ষ ব্যবস্থাপকদের কাছে সুপারিশ করেন। আমেরিকার

অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের কাছে ১৯৮৬ সালে এমনই এক সুপারিশ ছিল যে, 'ওয়াশিংটন ডিসিতে আগামী কয়েক দশক ধরে তীব্র শ্রমিক ঘাটতি দেখা দেবে', যার কারণে আমেরিকার অটোমোবাইল এসোসিয়েশন তাদের হেড অফিস ওয়াশিংটন ডিসির শহরতলি থেকে সরিয়ে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো শহরে স্থানান্তর করে। এ প্রেক্ষাপটে নিশ্চিত করে বলা যায়, কোন ধরনের সংগঠন গড়ে তোলা ও চালু রাখার ক্ষেত্রে শ্রমিক সরবরাহের সুবিধা না থাকলে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

সরকারি এজেন্সিসমূহ (Government agencies)

সরকারি এজেন্সিসমূহ হলো স্থানীয়, প্রাদেশিক ও জাতীয় পর্যায়ের ঐ সব সরকারি এজেন্সি, যারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে এবং আইন ও বিধিমালার বাধ্যবাধকতা যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা মনিটর করে। কারখানা পরিদর্শন বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, আয়কর বিভাগ, শ্রম অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা, বিদ্যুৎ বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা ব্যবসায়কে প্রয়োজনীয় সেবা দেয় ও সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা সেখানে পালন করা হয় কিনা তা তদারকি করে ও অবস্থা বিচারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় বহিস্থ পরিবেশ- সাধারণ ও কার্য পরিবেশ বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ পরিবেশেরও বিশ্লেষণ করা হয়। আমরা বহিস্থ পরিবেশের উপাদানগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। এবার আমরা পরবর্তী পাঠে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদানগুলো সম্পর্কে জানব।

সারসংক্ষেপ:

এ পাঠে সংগঠনের বহিস্থ পরিবেশের কৌশলগত বিশ্লেষণ করার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাংগঠনিক পরিবেশ হলো পরিবেশের ঐ সকল উপাদান ও শক্তি যা সংগঠনের কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে। সাংগঠনিক পরিবেশ দুরকম - অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও বহিস্থ পরিবেশ। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ হলো পরিবেশের ঐ সকল উপাদান ও শক্তি, যার উপর সংগঠনিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব আছে। বহিস্থ পরিবেশ হলো পরিবেশের ঐ সকল উপাদান ও শক্তি যার ওপর সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কোনো প্রভাব নেই। বহিস্থ পরিবেশ দুই ধরনের হয়। একটি হলো সাধারণ পরিবেশ বা মেগা পরিবেশ আর অন্যটি হলো শিল্প বা কার্য পরিবেশ। সাধারণ পরিবেশের উপাদান ছয়টি : জনমিতিগত, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, আইনগত-রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ। শিল্প বা কার্য পরিবেশের উপাদানগুলো হলো ক্রেতা ও মক্কেল, প্রতিযোগীরা, সরবরাহকারীগণ, শ্রমিক সরবরাহ এবং সরকারি এজেন্সিসমূহ। বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে কৌশলবিদগণ এ পরিবেশের প্রকৃতি ও ধরনধারণ সম্পর্কে জানতে পারে এবং সে অনুসারে কৌশল নির্বাচন করে বাজারে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে।

পাঠ-৩.২ অভ্যন্তরীণ পরিবেশের কৌশলগত বিশ্লেষণ ও পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনা

Strategic Analysis of Internal Environment and Management of Environmental Effects

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশ কী তা বলতে পারবেন।
- অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশউপাদানগুলো কী তা বলতে পারবেন।
- অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশউপাদানগুলোর প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ কী কী তা বলতে পারবেন।
- পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার প্রত্যেকটি কৌশল ও পদ্ধতির বর্ণনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশ ও তার উপাদানগুলোর প্রকৃতি জানার মাধ্যমে কৌশলবিদগণ নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে এ পাঠে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ নিয়ে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। কৌশলবিদগণ কিভাবে বহিস্থ পরিবেশ মোকাবেল করবে তা নিয়ে আরোচনা করা হয়েছে। যা হোক, প্রথমে আমরা অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশ কাকে বলে তা নিয়ে কথা বলব।

অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশ কাকে বলে

What is Internal or Micro Environment

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ হলো সামগ্রিক পরিবেশের ঐ সকল উপাদান ও শক্তি, যার ওপর সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব আছে। অর্থাৎ পরিবেশের যে সব উপাদানের ওপর ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ আছে সেগুলো নিয়ে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ গঠিত হয়। এ পরিবেশ সংগঠনের নিজস্ব পরিবেশ। এ জন্য সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা চাইলে তাদের মত করে এ পরিবেশের উপাদানগুলোকে সাজাতে পারে, বাড়াতে পারে,আবার কমাতেও পারে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা এমনটি করে। যা হোক, এবার আমরা অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করব। নিচের ছকে ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানগুলো দেখানো হলো:

চিত্র: অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানসমূহ

অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদানসমূহ

Elements of internal or micro environment

পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors)

পরিচালনা পর্ষদপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের কৌশল প্রণয়ন করে ও কার্য ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে এ পর্ষদ কৌশল পরিবর্তন করতে পারে এবং সে অনুযায়ী নতুন নির্দেশনা দিয়ে থাকে। পরিচালনা পর্ষদ কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেয় ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে, মনিটরিং করে ও তত্ত্বাবধান করে। এ পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠান ভেদে নানা নামে কাজ করে। একমালিকানা কারবারে মালিক, অংশীদারি কারবারে অংশীদারগণ, কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ, সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ট্রাস্টি পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনা কমিটি বা পরিচালনা বডি ইত্যাদি নাম হয়। যে নামেই থাকুক না কেন, এরাই কৌশলগত ব্যবস্থাপনার কাজগুলো সম্পাদনও নিয়ন্ত্রণ করে।

সাংগঠনিক সম্পদ (Organisational resources)

ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদান হিসেবে সাংগঠনিক সম্পদ বলতে প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদনের জন্য যে যে সম্পদ দরকার সবগুলোকেই বোঝায়। এ সম্পদগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো (১) ভৌত সম্পদ যেমন জমি, অফিস ভবন, কারখানা ভবন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামালসহ অন্য সব ধরনের মালামাল, গুদামঘর, মেশিন, আসবাবপত্র, অফিস যন্ত্রপাতি তথা কম্পিউটার,ফটোকপিয়ার মেশিন, এয়ার কন্ডিশানার, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, কাগজ, কলম ইত্যাদি। (২) মানব সম্পদ, যার মধ্যে পড়ে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সকল কর্মরত দক্ষ, অর্ধ দক্ষ ও অদক্ষ কর্মচারীগণ। (৩) আর্থিক সম্পদ, যার মধ্যে পড়ে ইক্যুইটি, ঋণ, বিনিয়োগ, আয়, মুনাফা, সঞ্চিতি ইত্যাদি সম্পদ যাকে ব্যবহার করে ভৌত ও অন্যান্য সম্পদ অর্জন করা হয়। (৪) তথ্য সম্পদ, যার মধ্যে পড়ে সকল ধরনের তথ্য যার সাহায্যে ব্যবস্থাপকগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। যেমন বাজার তথ্য, ক্রয়বিক্রয় তথ্য, কর্মচারীদের তথ্য, আয়ব্যয় তথ্য, বিনিয়োগ তথ্য, উৎপাদন তথ্য, অর্থনীতি, কারিগরি, জনমিতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনকানুন বিষয়ক তথ্য। এ সব তথ্য নিজস্ব উৎস থেকে পাওয়া যায়, আবার বাইরের উৎস থেকে অর্থের বিনিময়ে কিনে আনতে হয়। (৫) প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য যেমন চলতি প্রযুক্তির নব্য সংস্করণ, নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, প্রতিযোগীদের ব্যবহৃত প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য।

মালিক বা শেয়ারমালিকগণ(Owner or Shareholders)

মালিক পক্ষ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ মালিক পক্ষের নাম প্রতিষ্ঠান ভেদে নানা রকম হয়। একমালিকানা কারবারে শুধু মালিক, অংশীদারি কারবারে অংশীদারগণ, কোম্পানির ক্ষেত্রে শেয়ারমালিকগণ, সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ট্রাস্টিজ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকার, ইত্যাদি নাম হয়। মালিকগণ প্রতিষ্ঠানের কৌশল প্রণয়ন করে, নির্দেশনা দেয়, বাস্তবায়ন তদারকি করে ও দিনের শেষে সাফল্য - ব্যর্থতা পর্যালোচনা করে সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা নিয়ে সংগঠনকে সঠিক পথে নিয়ে আসে এবং সাফল্য নিশ্চিত করে। মালিকগণ কৌশল প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারে। মালিকগণ হলো সংগঠনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিশালী পক্ষ। তারাই কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেন ও কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মালিকগণই কৌশলগত ব্যবস্থাপনার অন্যতম নিয়ন্ত্রক।

সাংগঠনিক সংস্কৃতি (Organisational culture)

সাংগঠনিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। শক্তিশালী সাংগঠনিক সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে প্রবল ভাবে সহায়তা করে। ব্যবস্থাপকগণসহ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীদের সাংগঠনিক সংস্কৃতি মেনে চলতে হয়। সাংগঠনিক সংস্কৃতির কঠোর প্রতিপালন প্রত্যেক কর্মীর নিজ নিজ কাজ যেমন সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করে, তেমনই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তি ও দলের সুষ্ঠু আচার-আচরণ, নিয়মনীতি প্রতিপালন, সুন্দর ও সৌহার্দ্যমূলক মানব সম্পর্ক, কাজকর্মে শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ কার্যপরিবেশ বজায় রাখতে একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। একটি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি বহু দিনের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। সার্বিক বিচারে সাংগঠনিক সংস্কৃতিকে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা, প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য-ব্যর্থতা অনেকাংশে সাংগঠনিক সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে।

সাংগঠনিক সুনাম ও ভাবমূর্তি (Organisatinal reputation and image)

কথায় বলে 'মানুষ পণ্য কেনে না, সুনাম কেনে'। সাংগঠনিক পণ্য বা সেবার বাজার গ্রহণযোগ্যতা, ক্রেতার মনে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করা, সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন করা, সর্বসাধারণের কাছে আস্থাশীল হওয়া, দায়গ্রহণকারীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা, দেশের আইনকানুন মেনে চলা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাংগঠনিক সুনাম ও ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। এ কারণে ক্রেতাসাধারণ প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা কিনতে আগ্রহী হয় ও বারবার কেনে। এ সুনাম ও ভাবমূর্তির কারণে সংগঠন প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সাফল্য লাভ করে ও দীর্ঘদিন বাজারে টিকে থাকে। এ বিচারে সাংগঠনিক সুনাম ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের একটি মূল্যবান উপাদান। ব্যবস্থাপনা এটির উন্নয়নে অব্যাহত চেষ্টা করে এবং এটিকে সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার করে সাংগঠনিক সাফল্য নিশ্চিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বোঝতে পেরেছি যে, পরিবেশ সব ধরনের সংগঠনকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেশের এ প্রভাবকে স্বীকার করে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাকে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়। পরিবেশগত প্রভাব এড়ানো যায় না। তবে, এ প্রভাব কমানোর জন্য বা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থাপনা অগ্রচেষ্টামূলক কাজ করতে পারে।

এবার আমরা পরিবেশগত প্রভাব কোন কোন পন্থা ব্যবহার করে ব্যবস্থাপনা করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার পন্থাসমূহ

Approaches to manage environmental impacts

পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তারপরও সাংগঠনিক তত্ত্ববিদগণ মত প্রকাশ করেন যে, ব্যবস্থাপকদের গৃহীত কার্যক্রমে পরিবেশের উপাদানগুলো সাড়া দেয় এবং সে কারণে তারা কতকগুলো অগ্রচেষ্টার কৌশল বা পন্থা সুপারিশ করেছেন। থম্পসন (১৯৬৭) ও কট্টার (১৯৭৯) তিনটি কৌশল সুপারিশ করেছেন এবং প্রত্যেকটি কৌশলের অধীনে কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। এ ছাড়া, অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ আরও কয়েকটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। সবগুলো কৌশল বা পন্থা ও পদ্ধতি নিচের ছকে দেওয়া হলো ও তৎপরবর্তীতে প্রত্যেকটি পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। প্রথমে নিচের ছকটি দেখুন।

পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ

পন্থা (Approaches)	পদ্ধতি (Methods)
অভিযোজন	বাফারকরণ
	মসৃণকরণ
	পূর্বাভাষকরণ
	সীমিতকরণ
আনুকূল্য অর্জন চেষ্টা	বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ
	আওতা বর্ধিতকরণ
	লবিস্ট নিয়োগ
	চুক্তি বোঝাপড়াকরণ
	কো-অপটিং
	যৌথ-প্রচেষ্টা
	বাণিজ্য সমিতিতে অংশগ্রহণ
	রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদান
	ব্যবসায় একত্রিকরণ
ক্ষেত্র বদল	ক্ষেত্র বদল
	বহুমুখিকরণ

অভিযোজন

Adaptation

অভিযোজন পন্থায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা করতে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কার্য ও কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন করে সংগঠনকে পরিবেশের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়। এ পন্থায় বিদ্যমান পরিবেশকে প্রদত্ত ও অপরিবর্তনীয় ধরে নেয়া হয় এবং এর সাথে খাপখাওয়ানোর জন্য একটা যৌক্তিক প্রক্রিয়া বের করার চেষ্টা করা হয়। পরিবেশগত উত্থানপতনের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। সেগুলো নিয়ে এবার আলোচনা করবো:

১। বাফারকরণ (Buffering)

দুটি বস্তুর মধ্যে সংঘর্ষ যাতে না ঘটে তার জন্য তাদের মধ্যে যে ফারাক বা প্রতিবন্ধকতা রাখা হয়, তাকে বাফার বা সংঘর্ষবারক বলে। সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পণ্যের মজুত ও চাহিদা যাতে এক না হয়ে যায় সে জন্য সংঘর্ষবারক হিসেবে যে মজুত রাখা হয় তাকে বাফার বলে। এ জন্য বাজার চাহিদার পরিবর্তনকে মোকাবেলা করার জন্য অতিরিক্ত কাঁচামাল বা চূড়ান্ত পণ্য বা সেবার উপকরণ মজুত করে রাখার পদ্ধতিকে বাফারকরণ বলে। যখন প্রয়োজনের সময় কাঁচামাল সরবরাহের নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন কাঁচামালের বাফার মজুত গড়ে তোলা হয়। একই ভাবে বাজারে চূড়ান্ত পণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে স্বল্প সময়ে দ্রুত উৎপাদন করে তা মেটানো যায় না। ফলে বর্ধিত বাজার ও মুনাফা উভয় সুযোগই হারাতে হয়। এ জন্য চূড়ান্ত পণের বাফার মজুত গড়ে তোলা হয়। তবে, বাজার চাহিদার উঠতিপড়তি সঠিক ভাবে অনুমান করতে না পারলে বাফার মজুত ক্ষতির কারণ হয়।

২। মসৃণকরণ (Smoothing)

মসৃণকরণ হলো মন্দা বাজারে বা মৌসুমে বিক্রয় বৃদ্ধির একটা ক্ষণস্থায়ী পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বাজার পড়তির প্রভাব হ্রাস করা হয়। যেমন, গরম কালে শীত বস্ত্রের ওপর বিশেষ বাট্টা দিয়ে বিক্রয় করা হয়। খাবারের দোকান, ফাস্ট ফুড শপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান 'একটা কিনলে আর একটা ফ্রি', 'পরবর্তী ক্রয়ে বিশেষ ছাড়ের কুপন' প্রস্তাব দেয়। কিছু ধীর-বিক্রয় পণ্য আছে যেমন গল্পের বই, ডিকশনারি, বিশ্বকোষ ইত্যাদি পণ্য 'বিশেষ ছাড়' প্রস্তাবের মাধ্যমে 'মেলায়' বিক্রয় করা হয় বা সরাসরি বিক্রয় করা হয়। উচ্চ চাহিদা মেটাতে বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা মন্দা সময়ে অলস বসে থাকে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মসৃণকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৩। পূর্বাভাষকরণ (Forecasting)

পরিবেশগত অবস্থা অর্থাৎ পরিবেশের উত্থান, পতন বা অনড় অবস্থা সম্পর্কে পূর্বানুমান করার চেষ্টার নাম পূর্বাভাষকরণ। পূর্বাভাষকরণের নানা পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিবেশগত উপাদানগুলোর ভবিষ্যৎ অবস্থার ওঠানামা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য সংখ্যাতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক অনুমান করা যায়। এ অনুমানের ভিত্তিতে পূর্ব থেকে পণ্য বা সেবা প্রস্তুত রাখা যায় ও পরিবেশগত পরিবর্তনকে সহজে মোকাবেলা করা যায়। যেমন ভোক্তাদের ক্রয় স্বভাব, পছন্দের স্টাইল, নতুন পণ্যের চাহিদা, প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক নানা সূচক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধরনধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পরিবর্তন পূর্বাভাষকরণের মাধ্যমে অনুমান করা যায় এবং সে অনুযায়ী পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা নিয়ে রাখলে পরিবর্তনকে সংগঠনের পক্ষে ব্যবহার করা যায়। এ ভাবে সাংগঠনিক সাফল্য নিশ্চিত করা যায়, বাজার ধরে রাখা যায়, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় ও সাংগঠনিক স্থায়িত্ব বজায় রাখা যায়।

৪। সীমিতকরণ (Rationing)

উচ্চ চাহিদার সময়ে পণ্য বা সেবায় সীমিত প্রবেশাধিকার দেওয়ার উপায় হলো সীমিতকরণ। এ সীমিতকরণের মাধ্যমে চাহিদার অস্থায়ী বৃদ্ধির চাপে উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ এড়ানো যায়। আবার যখন পূর্বাভাষকৃত চাহিদার পরিমাণের চেয়ে বাস্তব চাহিদা বেশি হয় বা যখন উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে সময় লাগে, তখন সীমিতকরণ করা হয়। এ সীমিতকরণের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার 'আদেশ বা অর্ডার' ক্রমান্বয়ে প্রদান করার জন্য 'তালিকাভুক্ত' রাখার মাধ্যমে বাজার চাহিদা ধরে রাখা যায়।

আনুকূল্য অর্জন চেষ্টা

Favourability influence

আনুকূল্য অর্জন চেষ্টা হলো পরিবেশের উপাদানগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠনের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটা প্রচেষ্টা। এ কৌশলে পরিবেশকে প্রদত্ত বা অপরিবর্তনীয় মনে করা হয় না। বরং পরিবেশের উপাদানগুলোর কোনো না কোনো অবস্থার পরিবর্তন করে তা সংগঠনের অনুকূলে নিয়ে আসা যায় বলে মনে করা হয়। এ কৌশলের আওতায় যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ (Advertising and public relations)

পরিবেশেকে প্রভাবিত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো বিজ্ঞাপন। বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান একক ভাবে অথবা একই শিল্পে ব্যবসায়রত প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে বিজ্ঞাপনকে ব্যবহার করে পণ্য বা সেবার পক্ষে অনুকূল প্রচারণা চালিয়ে পরিবেশের ঋণাত্মক প্রভাবকে নিরপেক্ষ করে ফেলে অথবা পরিবেশকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসে। একই ভাবে, জনসংযোগ কর্মকান্ডের দ্বারা যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে শিল্পের পক্ষে বা পণ্যের পক্ষে সর্বসাধারণের মনে অনুকূল ধারণা সৃষ্টি করা হয়। মোট কথা, সম্মিলিত বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগঠনের পক্ষে অনুকূল জনমত তৈরি করে পরিবেশের প্রভাব এড়ানো যায় বা পরিবেশের উপাদান পরিবর্তন করা যায়। যেমন বাংলাদেশে বিজ্ঞাপন, জনসংযোগ ও অন্যান্য গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পক্ষে অনুকূল জনমত তৈরি করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।

২। আওতা বর্ধিতকরণ (Boundary spanning)

আওতা বর্ধিতকরণপদ্ধতিতে সংগঠনের মধ্যে এমন ভূমিকাযুক্ত পদ সৃষ্টি করা হয়, যারা পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে তথ্যের আদানপ্রদানের মাধ্যমে পরস্পরকে প্রভাবিত করে। আওতা বর্ধনকারীরা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজ ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকরণ কাজ এ দুধরনের কাজ করে। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজের ক্ষেত্রে তারা পরিবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাছাই করে এবং সংগঠনের মধ্যে যারা তথ্য ব্যবহার করে কাজ করে তাদের কাছে প্রেরণ করে। আর সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকরণ কাজের ক্ষেত্রে তারা সংগঠনের গুরুত্ববাহী তথ্যাদি বাইরের এমন পক্ষের কাছে প্রদান করে যারা সংগঠনকে প্রভাবিত করতে পারে। পরিবেশের প্রকৃতি অনুসারে সংগঠন যেমন নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে, তেমনই পরিবেশকে তথ্যাদির মাধ্যমে প্রভাবিত করে নিজের অনুকূলে আনতে পারে।

৩। তদবিরকারী নিয়োগ (Recruiting lobbyist)

তদবিরকারীনিয়োগ পদ্ধতিতে পরিবেশকে প্রভাবিত করার জন্য দুধরনের তদবিরকারীনিয়োগ দেওয়া হতে পারে। প্রথম ধরনটি হলো সংগঠনে এমন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগ দেওয়া হয়, যার পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে ও তাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় ধরনটি হলো বাইরের কোনো উপদেষ্টা সংগঠনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যারা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে ব্যবসায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন আইনকানুন বা বিধিবিধান প্রণয়ন করা থেকে বিরত রাখে বা তা বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত রাখে। এ ভাবে তদ্‌বিরকারীর মাধ্যমেপরিবেশগত প্রভাব থেকে সংগঠনকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়।

৪। চুক্তি বোঝাপড়াকরণ (Negotiating contract)

চুক্তি বোঝাপড়াকরণ পদ্ধতিতেপরিবেশের পক্ষগুলোর সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে ব্যবসায় সংগঠনের স্বার্থের অনুকূল শর্তে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। সরবরাহকারী, বণ্টনকারী, সরকারি-বেসরকারি সংগঠন ও এজেন্সির সঙ্গে চুক্তি করে অনুকূল প্রভাব লাভ করা যায়।

৫. সহযোজনকরণ (Co-opting)

প্রভাবিত করার অন্য একটি পদ্ধতি হলো সহযোজনকরণ। এ পদ্ধতিতে পরিবেশের প্রভাবশালী সদস্যকে সংগঠনের নেতৃত্ব বা নীতি নির্ধারণী কাঠামোর সদস্য করা হয়। জনপ্রিয় সহযোজনকরণ হলো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কোম্পানির পরিচালক পরিষদের সদস্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড বা ট্রাস্টি বোর্ডে সদস্য করা হয় পরিবেশের মূখ্য ব্যক্তিদের। এ সকল ব্যক্তিরা পরিবেশের ঋণাত্মক প্রভাব থেকে প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করে বা নানা উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহে সাহায্য করে। এ ভাবে পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রভাবিত করে।

৬. যৌথ প্রচেষ্টা(Joint ventures)

যৌথ প্রচেষ্টাএমন একটিপদ্ধতি,যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান মিলে চুক্তির মাধ্যমে যৌথ ভাবে কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে। পরিবেশের প্রভাবকে মোকাবেলা করতে প্রার্থীত পণ্য বা সেবা যখন একক কোনো প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করতে সক্ষম হয় না, তখন প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানরা এক জোট হয়ে যৌথ মালিকানায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ও তার মাধ্যমে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে। অনেক সময় যৌথ প্রচেষ্টায় সম্মিলিত তহবিল সংগ্রহ করে ব্যয়-বাজার-প্রযুক্তির বিচারে অধিক দক্ষতায় কোনো একটি জটিল উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য এমনটি করা হয়।

৭। বাণিজ্য সমিতিতে অংশগ্রহণ (Joining trade sssociations)

বাণিজ্য সমিতি হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাধারণ স্বার্থ সিদ্ধির একটি সংগঠিত সংস্থা। এ সমিতি বিরাট পরিমাণ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে বলে জনমত গঠন, সরকারকে প্রভাবিত করা ও আইন প্রণেতাগণকে প্রভাবিত করার কাজটি করতে পারে। এছাড়া, সমিতির মাধ্যমে নানা ধরনের ক্যাম্পইন করার মাধ্যমে পরিবেশকে প্রভাবিত করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের অনুকূলে আনতে পারে।

৮। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদান (Engaging in political activity)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীগণ পরিবেশকে প্রভাবিত করে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়। এ জন্য জাতীয় সংসদের সদস্য হতে রাজনৈতিক দলে যোগদান করে নির্বাচন করে, রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, অনুকূল আইন প্রণয়নের জন্য বা প্রতিকূল আইন প্রণয়ন ঠেকানোর জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করার মাধ্যমে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়।

৯। ব্যবসায় একত্রিকরণ (Business combination)

বহিস্থ পরিবেশের প্রভাব ঠেকানো বা বদলানোর জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো নানা রকমের ব্যবসায় একত্রিকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সমন্বিত শক্তি গঠন করে চেষ্টা করে। কার্টেল, পুল, সিন্ডিকেট, মার্জার, কৌশলগত সংঘ ইত্যাদি পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সম্পদকে একত্রিকরণ করেনতুন সংস্থা গড়ে তোলা, বৃহৎ তহবিল গঠন করে ‘গবেষণা ও উন্নয়নে’ বিনিয়োগ করা, আন্দোলন করা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়ে পরিবেশগত প্রভাব প্রতিরোধ বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়।

ক্ষেত্র বদল

Domain shift

পরিবেশগত উপাদানসমূহের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আর একটি কৌশল হলো ক্ষেত্র বদল। এটি হলো পণ্য বা সেবার মিশ্রণ বদলানো বা নতুন কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসায় শুরু করার কৌশল। এটি করার দুটি পদ্ধতি আছে, তা হলো সম্পূর্ণ ক্ষেত্র বদল ও পণ্য বহুমুখীকরণ।

১। সম্পূর্ণ ক্ষেত্র বদল (Changing domain completely)

এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়টি বর্তমান পণ্য বা সেবা উৎপাদন বদল করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পণ্য বা সেবা উৎপাদন শুরু করতে পারে অথবা নতুন কোন ভৌগলিক এলাকায় ব্যবসায় শুরু করতে পারে। যেমন, তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ করে দিয়ে ইলেক্ট্রনিকস পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শুরু করলে তা হবে সম্পূর্ণ ক্ষেত্র বদল। এভাবে পরিবেশগত প্রভাব এড়িয়ে বাজারে টিকে থাকা যায়।

২। বহুমুখীকরণ (Diversification)

একই পণ্যের নানা প্রকার তৈরি করে পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনা করা যায়। পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে নতুন বাজার সৃষ্টি করা যায়, আবার বর্তমান বাজার ধরেও রাখা যায়। বর্তমান পণ্য ও সেবার এ

সারসংক্ষেপঃ

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ হলো সামগ্রিক পরিবেশের ঐ সকল উপাদান ও শক্তি, যার ওপর সংগঠনিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব আছে। অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদান হলো পাঁচটি। সেগুলো হলো পরিচালনা পর্ষদ, সাংগঠনিক সম্পদ, মালিক বা শেয়ারমালিকগণ, সাংগঠনিক সংস্কৃতি সাংগঠনিক সুনাম ও ভাবমূর্তি। পরিবেশগত প্রভাব এড়ানো যায় না। তারপরও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপকগণ কতকগুলা কৌশল বা পন্থা গ্রহণ করে। সেগুলো হলো অভিযোজন পন্থা, আনুকূল্য অর্জন চেষ্টা পন্থা ও ক্ষেত্র বদল পন্থা। এ পন্থা বা কৌশলের অধীনে কতকগুলো পদ্ধতি আছে। অভিযোজন পন্থার মাধ্যমে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া হয়। এর মধ্যে পড়ে বাফারকরণ পদ্ধতি, মসৃণকরণ পদ্ধতি, পূর্বাভাষকরণ পদ্ধতি, ও সীমিতকরণ পদ্ধতি আছে। আনুকূল্য অর্জন চেষ্টা পন্থা হলো পরিবেশের উপাদানগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠনের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটা প্রচেষ্টা। এর পদ্ধতিগুলো হলো বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ, আওতা বর্ধিতকরণ, লবিস্ট নিয়োগ, চুক্তি বোঝাপড়াকরণ, কো-অপটিং, যৌথ-প্রচেষ্টা, বাণিজ্য সমিতিতে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদান এবং ব্যবসায় একত্রিকরণ। আর একটি কৌশল হলো ক্ষেত্র বদল। এটি হলো পণ্য বা সেবার মিশ্রণ বদলানো বা নতুন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায় শুরু করার কৌশল। এটি করার দুটি পদ্ধতি আছে, তা হলো সম্পূর্ণ ক্ষেত্র বদল ও পণ্য বহুমুখীকরণ।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১. সাংগঠনিক পরিবেশ কাকে বলে ?
২. বহিস্থপরিবেশ কী বুঝিয়ে বলুন।
৩. বহিস্থপরিবেশ বিশ্লেষণ কাকে বলে তা বর্ণনা করুন।
৪. বহিস্থ পরিবেশ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৫. বহিস্থপরিবেশের উপাদানগুলো প্রদর্শন করে একটি ছক আঁকুন।
৬. প্রযুক্তিগত পরিবেশ উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন।
৭. বাংলাদেশের যে কোন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক পরিবেশ নিয়ে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৮. উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের জনমিতিগত পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করুন।
৯. বহিস্থপরিবেশের উপাদানগুলো আলোচনা করুন।
১০. সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ কৌশলগত ব্যবস্থাপনাকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করুন।
১১. কার্যপরিবেশ কী?
১২. কার্যপরিবেশের উপাদানগুলো কী কী তা বর্ণনা করুন।
১৩. অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশ বলতে কী বোঝায়?
১৪. অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশেরউপাদানগুলো কী?
১৫. অভ্যন্তরীণ বা ব্যষ্টিক পরিবেশউপাদানগুলোর প্রকৃতি বর্ণনা করুন।
১৬. পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র বদল পন্থা ও তার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।
১৭. পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার আনুকূল্য অর্জন চেষ্টা পন্থা ও তার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।
১৮. পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনার অভিযোজন পন্থায় পন্থা ও তার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।